وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ
مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۗ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾
وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ
قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا
بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا
حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

(৮২) তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। (৮৪) অতএব দেখ, গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে। (৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮৬) তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৮৭) আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে ছবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮৪ নং আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ
سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ

অর্থাৎ, যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জিবরাঈল (আঃ) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ, এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্যে পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় বিকট নাদ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চীৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চীৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্যে উপর থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উলটিয়ে দেয়া হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

লুত (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল।

সূরা হুদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাকে আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ, উলটে দেয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়েই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লুত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদুমের অবস্থান স্থল।

পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব

(আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আঃ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে বস্তিতে তারা বসবাস করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব 'মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র মূসা (আঃ) -এর কাহিনীতে বলা হয়েছে وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এতে এ বস্তিটিকে বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে 'খতিবুল আম্বিয়া' বলা হয়।- (ইবনে কাছীর, বাহ্‌রে মুহীত)

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে 'আহলে মাদইয়ান' ও 'আছহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও 'আছহাবে আইকা' নামে। 'আইকা' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আছহাবে মাদইয়ান' ও 'আছহাবে আইকা' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আছহাবে মাদইয়ানের উপর কোথাও صيحة এবং কোথাও رجفة এবং আছহাবে আইকার উপর কোথাও ظلة এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চীৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আছহাবে আইকার উপর এভাবে আযাব নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে খোদায়ী অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে ধ্বংসভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আছহাবে মাদইয়ান' ও 'আছহাবে আইকা' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লেখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাছীর এ তফসীরেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর ব্যাখার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু'প্রকার ঃ (এক) সরাসরি আল্লাহ্‌র হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন— এবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি। (দুই) বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্‌র হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্টবস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মো'জেযা, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মো'জেযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

এতে كيل শব্দের অর্থ মাপ এবং ميزان শব্দের অর্থ ওজন করা। بخس শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ বলে সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।- (বাহ্‌রে মুহীত)

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া যেমন - হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারও ইযযত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজেব, তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের ইযযত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কোরআন পাকে تطفيف ও مطففين এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত সব বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকু-সেজদা করতে দেখে বললেন ঃ قد طففت অর্থাৎ, তুমি মাপ ও ওজনে ত্রুটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ, তুমি নামাযের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ না করাকে تطفيف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ সংস্কার হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে উত্তম। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্যে যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করার জন্যে পথে-ঘাটে ওত পেতে বসে থেকো না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক। অর্থাৎ, তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আঃ) -এর কাছে আমানতকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করার জন্যে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা কুর্তবী বলেন ঃ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্সআদায় করে, তারাও শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ এখানে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তাআলা ঐশ্বর্য্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থ বলা হয়েছে ঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর—কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করো।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ, তাড়াহুড়া কিসের? আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا
قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا
فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ
شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّىٰ
عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ
إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ
آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল ঃ হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল ঃ আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্‌র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বলল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (৯১) অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৯৩) অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব? (৯৪) আর আমি কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি, তবে (এমতাবস্থায় যে) পাকড়াও করেছি সে জনপদের অধিবাসীদিগকে কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। (৯৫) অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়েছি। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি এমন আকস্মিকভাবে যে তারা টেরও পায়নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শোয়ায়েব (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল ঃ আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শোয়ায়েব (আঃ) বললেন ঃ তাড়াহুড়া কিসের? অতি সত্বর আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল ঃ হে শোয়ায়েব, হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্মে 'ফিরে আসা' কথাটা মুমিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আঃ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্‌র কোন পয়গম্বর কখনও কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কেও সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আঃ) উত্তরে বললেনঃ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ অর্থাৎ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ, এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হল।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব (আঃ) জাতিকে বললেন ঃ তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা।

কেননা, প্রথমতঃ কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবী ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবী করা বাহ্যতঃ দাসত্বের পরিপন্থী এবং নৈকট্যশীল ও আধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন; তাই পরে বলেছেনঃ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن

يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (খোদা না করুন) আমাদের প্রতিপালকই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা

করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? কোন সৎকাজ করা অথবা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে। যেমন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : فوا الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولاصلينا অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না ছদকা খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামায পড়তে সক্ষম হতাম না।

জাতির অহঙ্কারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করলেন : رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : فتح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فاتح শব্দটি قاضى অর্থাৎ, বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়।— (বাহ্‌রে মুহীত)

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহঙ্কারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পর অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল : যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে।— (বাহ্‌রে মুহীত)

চতুর্থ আয়াতে তাদের আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ অর্থাৎ, তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন : শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি, পানিতেও তাদের জন্যে শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ্ তাআলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নীচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে।— (বাহ্‌রে মুহীত)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন আযাব এসেছে। ফলে এক অংশ ভূমিকম্পে এবং এক অংশ ছায়া আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا - غنى শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হল, যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে : الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ অর্থাৎ, যারা শোয়ায়েব (আঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে : فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ অর্থাৎ, স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শোয়ায়েব (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদগণ বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আঃ) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশে বললেন : আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্খায় কোন ত্রুটি করিনি; কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

পূর্ববর্তী নবিগণ (আঃ), তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলী যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকু পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচ জন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা(আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোরআনে করীম বিশ্ব-ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হল এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মত আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবি-রসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে তারা নিজেদের গতি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে।

কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয় বেশী। আর এই বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ রাহ্‌মানুর-রহীমেরই দান। উল্লেখিত আয়াতে بؤس ও بأساء শব্দ দু'টির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضر ও ضراء শব্দদুয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোন কোন অভিধানবিদ অবশ্য بؤس ও بأساء শব্দ দু'টির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضر ও ضراء অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেয়া যাতে পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে। পরবর্তি আয়াতে ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا এখানে سَيِّئَةٌ শব্দে পূর্বোল্লেখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ করা হয়েছে। আর حَسَنَةٌ শব্দে উদ্দেশ করা হয়েছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক; ধন-সম্পদের বিস্তৃতি ও স্বচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। عفوا শব্দটি عفو থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদিগকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে; আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি। বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, 'এটা কোন নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও রোগ কখনও স্বাস্থ্য, কখনও দারিদ্র্য, কখনও স্বচ্ছলতা— এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরকেও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তখনই ধরা পড়লো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (বাগ্‌তাতান) হঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ, যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن
يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ
لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ
أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾
تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ
كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا
لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَ
قَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

(৯৬) আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। (৯৭) এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলা-ধুলায় মত্ত। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। (১০০) তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুতঃ আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (১০১) এগুলো হল সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌঁছেছিলেন রসূল নিদর্শন সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ কাফেরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (১০২) আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী। (১০৩) অতঃপর আমি তাঁদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তাঁর মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আন্‌ত এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। 'আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেয়া' বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া। অর্থাৎ, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় নেয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মো'জেযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্য-দ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র, কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধন-সম্পদেও হতে পারে, মন মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজ-কর্মেও হতে পারে। কোন কোন সময় মাত্র একগ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণশক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। বস্তুতঃ এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তু-রাজির বরকত ঈমান ও পরহেযগারীর উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেযগারী পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত

হতে হয়। বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশী যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা-কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচুর্য্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ন ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এছাড়া আর কি বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের বরকত শেষ হয়ে গেছে।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ

أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ আয়াতে يهدى، هدى অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেয়া। এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূ-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ, বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্ তাআলার আযাব ও গযব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে— وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

طبع শব্দের অর্থ ছাপ এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহ্‌র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, কোন লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে; তওবা না করে, তাহলে এই কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কোরআনে ران অর্থাৎ, অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طبع অর্থাৎ, মোহর এঁটে দেয়া হয় বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি-কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোন প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃ হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ, 'তারা বোঝে না' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কোরআনে-করীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ, তারা শুনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোন সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হল তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোন রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোন বিষয়ের ভাল কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا আয়াতে এখানে انباء শব্দটি نبأ এর বহুবচন। যার অর্থ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ, বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোন কোন ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে من বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলী আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয়, বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ, এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রসূলগণ তাদের কাছে মু'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন)— সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জেযা এবং দলীল-প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় জানা গেল যে, সমস্ত নবী-রসূলকেই মু'জেযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোন নবী (আঃ)-এর মু'জেযার আলোচনা কোরআনে এসেছে, অনেকের আসেও নি। এতে এমন কোন ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জেযার বিষয় কোরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোন মু'জেযাই ছিল না। আর সূরা হুদ-এ হযরত হুদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের যে উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ, আপনি কোন মু'জেযা উপস্থিত করেননি— এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুঁয়েমীবশতঃ কিংবা তাঁর মু'জেযাগুলোকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে একথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কোন ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ আসুক না কেন, নিজের ধ্যান-ধারণা থেকে ফিরতো না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলেম-ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোন বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তাঁরা নিজের সে ধারণাই অনুসরণ করতে থাকেন। সূফীতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহ্‌র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছে كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ, যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

তারপর বলা হয়েছে, وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ অর্থাৎ, আমি

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ
بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ
فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ
عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾
قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ
بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾
قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾
قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ
وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَ
أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾

(১০৫) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। (১০৬) সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১০৭) তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১০৮) আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (১০৯) ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। (১১০) সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত? (১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য-(১১২) যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে। (১১৩) বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? (১১৪) সে বলল, হাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (১১৬) তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। (১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। (১২০) এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। (১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারেরপ্রতি।

তাদের অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি।

এ পর্যন্ত বিগত নবী-রসূল (আঃ)-গণ এবং তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশসংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সেজন্যই কোরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এ সূরা নবী-রসূলগণ এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে, এ হল সেগুলার মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাসমূহ বিগত অন্যান্য নবী-রসূলগণের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশী, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশী কঠিন। তদুপরি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের কথা এসেছে।

১০৩ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ, হযরত নূহ, হুদ সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আঃ)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মূসা (আঃ)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা আয়াত' বলতে আসমানী কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফেরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়।—(কুরতুবী)

فَظَلَمُوا بِهَا – এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হল নিদর্শন। অর্থাৎ, তারা আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হল এই যে আল্লাহ্ তাআলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বোঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ, জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীত ব্যবহার করা।

অতঃপর বলা হয়েছে, فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব পালক আল্লাহ্ তাআলার রসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুওয়তী মর্যাদা তার দাবী হলো, যাতে আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সত্য ছাড়া কোন বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবীগণকে (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা হয় তাঁদের নিকট আল্লাহ্‌র আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোন

পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত-নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর ; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি ; বরং আমার দাবীর স্বপক্ষে আমার মু'জেযাসমূহও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন, আমার কথা মান। বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোন কথাই লক্ষ করল না ; মু'জেযা দেখাবার দাবী করতে লাগল এবং বলল, إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ, বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জেযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

হযরত মূসা (আঃ) তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন ; আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ 'সু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُّبِيْنٌ (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না— সাধারণতঃ যা যাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি— সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর শরণাপন্ন হল; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। - (তফসীরে - কবীর)

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জেযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোন ঐশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মত কোন বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে — وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ — نزع (নাযউন) অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধমে বের করা। অর্থাৎ, নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে থেকে অর্থাৎ, কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জেযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ, সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকতো।

তখন ফেরাউনের দাবীতে হযরত মূসা (আঃ) দু'টি মু'জেযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জেযাটি ছিল বিরোধীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য; আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে; আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

قَالَ الْمَلَأُ - ملأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জেযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী যাদুকর। তার কারণ, প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর যাদুকরদিগকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং যাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে! কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাযাদু। কিন্তু তারাও এখানে ساحر এর সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) - এর মু'জেযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ যাদুকর।

মু'জেযা ও যাদুর পার্থক্য ঃ বস্তুত ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বযুগেই নবী রসূলগণের মু'জেযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জেযা ও যাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। যাদুকররা সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশী হবে, তাদের যাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী রসূলগণের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই নবুওয়তের দাবীর পর কারও কোন যাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, যাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, একাজটি বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জেযাতে বাহ্যিক বা মানসিক কোন বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের কাজ। তাই কোরআন মজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তাআলারা সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى - এবং আল্লাহ্ তাআলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জেযা এবং যাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোন কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশে এমনসব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে নিজেদের যাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ

যাদুকর, সাধারণ যাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ অর্থাৎ, এই বিজ্ঞ যাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদিগকে দেশ থেকে বের করে দেয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

এ আয়াতগুলোতে মূসা (আঃ)–এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরআউন যখন হযরত মূসা (আঃ)–এর প্রকৃষ্ট মু'জেযা দেখল; লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মূসা (আঃ)–এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ যাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদিগকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ এ বাক্যটিতে ارجه শব্দটি ارجاء থেকে উদ্ভূত— যার অর্থ ঢিল দেয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مدائن শব্দটি مدينة এর বহুবচন, যা যেকোন বড় শহরকে বলা হয়। حٰشِرِيْن শব্দটি حاشر এর বহুবচন যার অর্থ হলো আহবানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হল সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যাদুকরদিগকে তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে যারা তাকে যাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য–সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে যাদুকরদিগকে ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন যাদু–মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা (আঃ)–কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জেযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল যাতে যাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জেযার মোকাবেলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্ তাআলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী–রসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জেযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)–এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জেযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রসূলে করীম (সাঃ)–এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই হুযূরে আকরাম (সাঃ)–এর সবচেয়ে বড় মু'জেযা হল কোরআন যার মোকাবেলায় গোটা আরব–আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

মূসা (আঃ)–এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশে সারা দেশ থেকে যেসব যাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল।— (কুরতুবী)

ফেরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্তবাদী, পার্থিব লাভই হল তাদের মুখ্য। কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী–রসূলগণ এবং তাঁদের যাঁরা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন — وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্র উপরই রয়েছে। ফেরআউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেয়ার পর যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)–এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হল। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে—

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় যাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আঃ) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে বলল, আমাদের কাছে এমন যাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর অগত্যাই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব।— (মাযহারী, কুরতুবী)

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ

এখানে القاء এর অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন যাদুকরেরা হযরত মূসা (আঃ)–কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। যাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ, আমরা নিজের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথমে আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশে হযরত মূসা (আঃ)–কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আঃ) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জেযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, القوا অর্থাৎ, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তফসীরে–ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, যাদুকররা হযরত মূসা

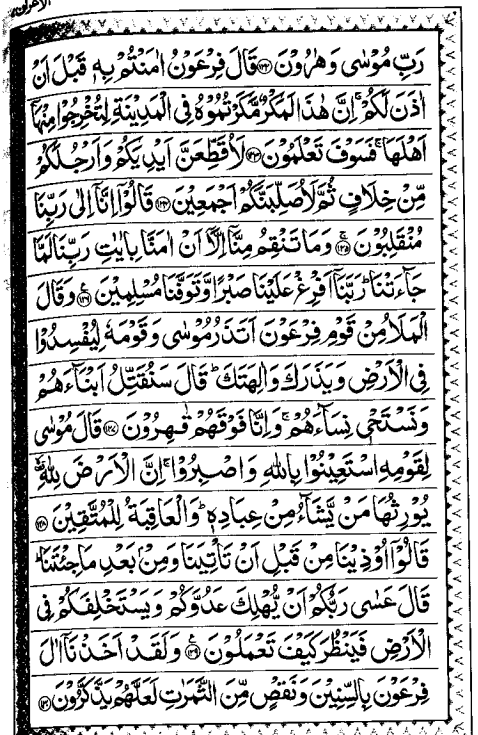

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ
آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا
أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم
مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا
جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

(১২২) যিনি মূসা ও হারূনের পরওয়ারদেগার। (১২৩) ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে—এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। (১২৪) অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে মারব। (১২৫) তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে। (১২৬) বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। (১২৭) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে, আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। (১২৮) মূসা বললেন তাঁর কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (১২৯) তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (১৩০) তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(আঃ)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ, যাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাযাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, যাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং যাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ, শরীয়তের বা যুক্তির কোন প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রকার যাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরীয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

অর্থাৎ, আমি মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধরে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব যাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, যাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) এ দু'জন ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে সবচেয়ে বড় যাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল

ছয় লক্ষ জনসাধারণ; তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফেরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মূসা (আঃ)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশে করেছ। إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ অর্থাৎ, এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর যাদুকরদিগকে লক্ষ্য করে বলল, آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে! অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহস্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরকেও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা আর যাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মূসা (আঃ)-এর কার্যকলাপ এবং যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই ফেরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না— একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশে বলল, لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا অর্থাৎ, তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদিগকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই চাতুর্য-চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ, তোমাদের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কারভাবে বলল لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ, আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয়পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফেরআউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পারিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোন আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মোকাবেলা করতে তৈরী হয়ে যায়।

যে যাদুকররা কয়েক ঘণ্টা আগেও ফেরআউনকে নিজের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কলেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠল : إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ অর্থাৎ, তুমি যদি আমাদিগকে হত্যা করে ফেল, তাতে কিছু আসে যায় না, আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শান্তি পাব।

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো যে, তোমার হুকুম আমাদের পার্থিবজীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোষানলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই অবশিষ্ট রয়নি যা ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ, আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শান্তিও স্থায়ী, অশান্তিও স্থায়ী।

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরীতে আক্রান্ত ছিল, ফেরাউনের মত একজন বাজে লোককে খোদা হিসাবে মানত, আল্লাহ্‌র মহিমা-মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এল যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দ্বীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদের সৎসাহসই যে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

অর্থাৎ, — হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদিগকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদিগকে মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি না চান, তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে দৃঢ়তা লাভ করার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ, ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

যাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আঃ)-এর এক বিরাট মু'জেযা ঃ পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারা জীবন আল্লাহ্‌র পরিচয়বিমুখ নাস্তিক-কাফেরদিগকে মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর এই মু'জেযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জেযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ভীতিজনক

প্রতিক্রিয়া : ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খজাতিকে তার সাথে পুরাতন পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মত ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। মূসা (আঃ) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হল :

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ, তাহলে কি তুমি মূসা (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে ?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরআউন বলল : سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ অর্থাৎ, তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা-সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই ; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

তফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরআউন একথাই বলল যে, আমরা বনী-ইসরাঈলের ছেলে-সন্তানদিগকে হত্যা করে দেব, কিন্তু হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোন কথাই এল না। তার কারণ হযরত মূসা (আঃ)- এর এই মু'জেযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন-মস্তিষ্কে হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখত, তখন অবচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত।

ফেরআউন মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী-ইসলাঈলদের প্রতি তার রাগ ঝাড়ল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা করে মেয়েদিগকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী-ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে ফেরআউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূসা (আঃ)ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রসূল জনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছেঃ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে - إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, সমগ্র ভূমি আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহেযগারগণই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেযগারী অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা : হযরত মূসা (আঃ) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী-ইসরাঈলদিগকে যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার শিক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হল এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবেলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এই সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, 'সবর' এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হল ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীর স্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোন বিপদে ধৈর্য ধারণকেও সেজন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোন বৃহদোদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ)- এর এরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নেয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোন নেয়ামত কেউ পায়নি। - (আবু দাউদ)

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কূটিলমতি বনী-ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল— أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ, আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, আমরা কি করব।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ
مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ
مُّفَصَّلٰتٍ ۫ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا
وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى
اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا
غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ
مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

(১৩১) অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহ্‌রই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। (১৩২) তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। (১৩৩) সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (১৩৪) আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মূসা। আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। (১৩৫) অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত- যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল , তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। (১৩৭) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের জাদুকররা মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত ও কুফরীতে আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু'জেযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আয়াতে এই নয়টি মু'জেযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এই নয়টি মু'জেযার মধ্যে প্রথম দু'টি মু'জেযা অর্থাৎ, লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আঃ) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জেযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলে আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মু'জেযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আযাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে-মুন্যির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আযাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেয়া হত।

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, এরা এতই উদ্ধত যে দুর্ভিক্ষের আযাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে।

এবার তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভর্ৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ্ প্রথমে তাদের উপর নাযিল করেন তুফানজনিত আযাব। প্রখ্যাত মুফাসসেরগণের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ, জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে পড়ল। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ-বাসের কোন ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী-ইসরাঈলদেরও জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী। অথচ বনী-ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ পানির নীচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রার্থনা করল যে, আপনার পরওয়ারদেগোরের দরবারে দোয়া করুন যাতে এ আযাব দূর হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্ত করে দেব। মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আসলে এই তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোন আযাব ছিল না;বরং আমাদের ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং মূসা (আঃ)-এর এতে কোন দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হল না। তখন দ্বিতীয় আযাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষিত করে ফেলল। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আযাবের ক্ষেত্রেও মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিব্‌তী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘর-বাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘর-বাড়ী, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চীৎকার করতে লাগল এবং মূসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এবার আপনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়া করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্তি দিয়ে দেব। তখন মূসা (আঃ) আবার দোয়া করলেন এবং এ আযাবও সরে গেল। আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বছরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হল। ঈমানও আনল না, বনী-ইসরাঈলদিগকেও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ্ তাআলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আযাব قمل (কোম্মালা)। قمل সে উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণতঃ ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কোম্মালের এ আযাবে সম্ভবতঃ উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আঃ) -এর দোয়ায় এ আযাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে! অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার একমাসের সময় দেয়া হলো। যাতে প্রচুর আরাম-আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আযাব হিসাবে এসে হাযির হল ব্যাঙ। এত অধিক সংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে ব্যাঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সব কিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়ায় এ আযাবও সরলো।

কিন্তু যে জাতির উপর খোদায়ী গযব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, মূসা (আঃ) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আযাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউয থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরী করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আযাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আঃ)-এর এ মু'জেযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোন আযাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আযাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী-ইসরাঈলদের বাড়ী থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে বসে কিবতী ও বনী-ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী-ইসরাঈলেরা তুলত তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঘোট কোন কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আযাবও পূর্বরীতি অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হল এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আযাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কোরআন বলেছে— فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ অর্থাৎ, এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুতঃ এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আযাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجْز এর নাম বলা

হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رجز (রিজয) বলা হয়। তফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আযাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আযাব। তাহল এই যে, তারা নিজেদের ঘর-বাড়ী,জমি-জমা ও আসবাবপত্র ছেড়ে মূসা (আঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণতি হয়। তাই বলা হয়েছে—

فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا অর্থাৎ – যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কোরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে 'যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল' বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে! কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্রই হাতে।

আর যমিনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَأَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধন-সম্পদের মালিক তাঁর সন্তানেরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র জানা মতে বনী-ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে-ফেরাউনের ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقَ শব্দটি مشرق এর বহুবচন। আর مغارب হচ্ছে مغرب এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' (উদয়াচলসমূহ) এবং 'মাগারিব' (অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্সেরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে – যাতে আল্লাহ্ তাআলা কওমে-ফেরাউন ও কওমে-আ'মালেকাহ্কে ধ্বংস করার পর বনী-ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবেলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বস্রী (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হল তার মোকাবেলা না করে বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবেলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ, নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক সে ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোন লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবেলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ্ বনী-ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদিগকে শত্রুর উপর বিজয় এবং যমীনের উপরে শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন।–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

আর যেভাবে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহ্র ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহ্র সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে।– (রূহুল-বয়ান)

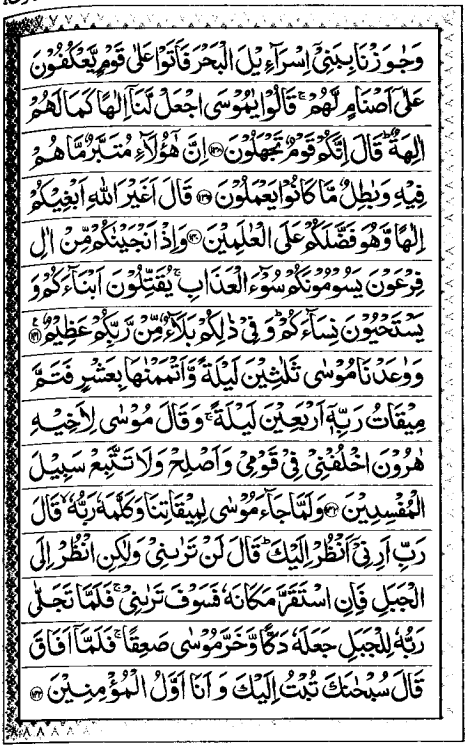

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ
عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ
اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ
فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ
اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ
يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾
وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ
مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ
هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ
رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى
الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى
رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ
قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

(১৩৮) বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী–ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (১৩৯) এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল! (১৪০) তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদিগকে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র–সন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে। (১৪২) আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। (১৪৩) তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ অর্থাৎ, আমি বনী–ইসরাঈলদিগকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় বনী–ইসরাঈলদের যে অলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ওরাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল।

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি মূসা (আঃ)–এর মু'জেযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী–ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি–নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা (আঃ)–এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যেও এমনি ধরনের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে এবাদত–উপাসনা করতে পারি; আল্লাহ্‌র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ – তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি–নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতি–নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ, তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মূসা (আঃ)–এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতঃপর বনী–ইসরাঈলদিগকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা করে নারীদিগকে অব্যাহতি দেয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশে। আল্লাহ্ মূসা (আঃ)–এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল–আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এযে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

এতে وَوٰعَدْنَا শব্দটি وعد (ওয়াদাহ্) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হল এই যে, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)–এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা (আঃ) ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে এ'তেকাফ ও আল্লাহ্‌র এবাদত–আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وَوٰعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ জাল্লা–শানুহুর পক্ষ থেকে ছিল তওরাত দানের

প্রতিশ্রুতি; আর মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং এ'তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَوَعَدْنَا না বলে وَوٰعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ চল্লিশ রাত এ'তেকাফ করানোই যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের এ'তেকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহ্‌র হেকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলেম সমাজ এর কিছু কিছু হেকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হল ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমানুয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদিগকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আরও সময় দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, মূসা (আঃ)-এর সাথে হয়েছে – ত্রিশ রাত্রিতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত্রি বাড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ, এই দশ রাত্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে তফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাত্রির এ'তেকাফের সময় হযরত মূসা (আঃ) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোন ইফতার করেন নাই। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ্ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন! কাজেই আরও দশটি রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন তফসীর-সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোযার পর হযরত মূসা (আঃ) মেসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোযাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোযাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমতঃ এই রেওয়ায়েতের কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু মূসা (আঃ)-এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোযার সময় মেসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী (সাঃ)-এর শরীয়তে রোযার অবস্থায় মেসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন: خير خصائل الصيام السواك অর্থাৎ, রোযাদারের সর্বোত্তম কাজ হল মেসওয়াক করা। এই রেওয়ায়েতটি জামেউস্-সগীরে উদ্ধৃত করে, একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য: এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, اٰتِنَا غَدَاۤءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ, – আমাদের নাশতা বের কর। কারণ, এ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিশ্রান্ত সম্মুখীন করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোযা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোন ইফতার করা যাবে না-বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তফসীরে রূহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদেগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোযা পর্যন্ত কোন কষ্টই তিনি অনুভব করেন নাই।

এবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ: আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রসূলগণের শরীয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী-রসূলগণের শরীয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় রাত এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানী যত গ্রন্থ রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে-আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك অর্থাৎ, – সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য; আর চান্দ্র হিসাব হলো এবাদত-উপাসনার জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল যিলক্বদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর যিলহজ্জ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কোরবানীর দিনে। – (কুরতুবী)

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য: এ আয়াতের ইঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে যে, আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, আল্লাহ্ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হেকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন। – (রূহুল-বয়ান)

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর-স্থিরতা ও ক্রমানুয়ের শিক্ষা: এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেয়া এবং তা ধীর-স্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ্ তাআলার রীতি। কোন কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ, বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্‌র পক্ষে আসমান-যমীন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে মূসা (আঃ)-কে তওরাত দান করার জন্যে যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হল সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনী-ইসরাঈলদিগকে গোমরাহীর সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, মূসা (আঃ) তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোন নেতা নির্ধারণ করে নেয়াই উচিত। তার ফলে তারা সবাই 'সামেরী'-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীর-স্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হত না। -(কুরতুবী)

প্রয়োজনবশত ঃ স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ ঃ প্রথমতঃ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারূন (আঃ) কে বললেন, اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي অর্থাৎ, আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোন লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-কে খলীফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রাঃ)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন।-(কুরতুবী)

মূসা (আঃ) হারূন (আঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়েত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল وَأَصْلِحْ এখানে أَصْلِحْ এর কোন 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার এসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও এসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও এসলাহ করবেন। অর্থাৎ, তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা জনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়েত দেয়া হলো এই যে, وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হারূন (আঃ) হলেন আল্লাহ্র নবী,তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারূন (আঃ) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী' এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথা মত 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামী থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আঃ) যখন ধারণা করলেন যে, হারূন (আঃ) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুযুর্গী বলে মনে করে থাকেন।

لَنْ تَرَانِي (অর্থাৎ, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে অর্থাৎ, মূসা (আঃ) বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে لَنْ تَرَانِي না বলে বলা হত, لن ارى 'আমার দর্শন হতে পারে না'।-(মাযহারী)

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল, অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ্র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন, সহী মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে— لن يرى احد منكم ربه حتى يموت অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদেগারকে দেখতে পারবে না।"

وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহ্র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয় ; মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে ?

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ আরবী অভিধানে تَجَلِّي অর্থ, প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোন বিষয়কে কোন কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোন বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ্ তাআলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্র তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্র কালাম বা বাক্যবিনিময় ঃ এ বিষয়টি তো কোরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) -এর সাথে সরাসরিই বাক্য বিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ সেসব কালাম যা নবুওয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময়

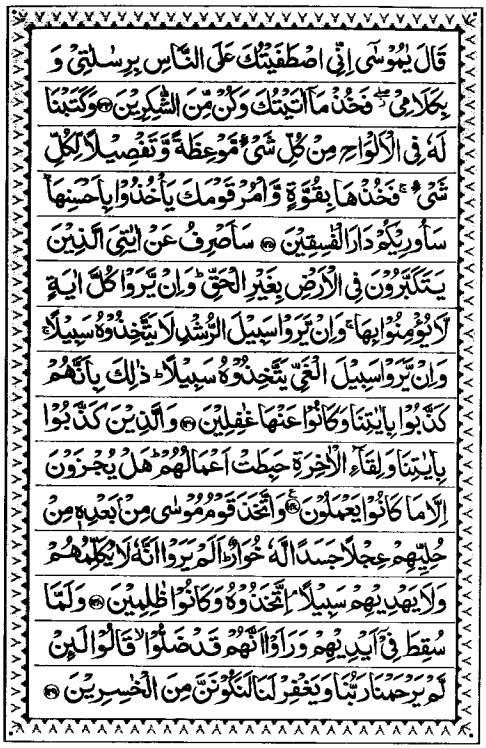

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ
بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا
لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا
سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ
يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ
لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۗ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا
سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ
لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

(১৪৪) (পরওয়ারদেগার) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। (১৪৫) আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান। (১৪৬) আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। (১৪৭) বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত। (১৪৮) আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল জালেম। (১৪৯) অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তবে এতে শরীয়তের পরিপন্থী নয়, এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোন একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী-তাবেঈগণের মতামতই সব চাইতে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়া এবং নানা ধরনের সম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ানোয় পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ক্ষেত্রের অর্থ কি? এতে দু'টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য' সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর এর ভিত্তি হল এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনী-ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন আয়াত وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আঃ)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তওরাত'।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত, অহংকারী হয়।"

এখানে "অধিকার না থাকা" শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মোকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় বা গোনাহ্ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন, প্রবাদ আছে অর্থাৎ, অহংকারীদের সাথে প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা।— (মাসায়েলে-সুলুক)

অহংকার মানুষকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও ঐশী এলম থেকে বঞ্চিত করে দেয় ঃ গর্বিত-অহংকারীদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহ্র নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বোঝা বা উপলব্ধি করার এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেয়া হয়। আর এখানে 'আল্লাহ্র নিদর্শন বা

আয়াত' কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তওরাত, যবুর ও কোরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শনসমূহ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ যা আসমান, যমীন ও তাতে অবস্থিত সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, 'তাকাব্বুর, অর্থাৎ, নিজকে নিজে অন্যান্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দুষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়,তার শুধু বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কোরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তওফীক, না আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নির্দশনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্র মা'রেফাত বা পরিচয় লাভে মন চলে।

তফসীরে রূহুল-বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস,যা ঐশী জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহ্রই রহমতে। আর আল্লাহ্র রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে।

হযরত মূসা (আঃ) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতিপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কারণ, তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী-ইসরাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনা-রূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এ ক্ষেত্রে عِجْلًا শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখণ সে বনী-ইসরাঈলদিগকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। মূসা (আঃ) তো আল্লাহ্র সাথে কথা বলার জন্যে গেছেন তূর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। মূসা (আঃ)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী-ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে খোদা মনে করে তারই উপাসনা-এবাদতে প্রবৃত্ত হল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَ
لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَ
أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾
وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ
تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

(১৫০) তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ! তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন! ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (১৫১) মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়। (১৫২) অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৫৪) তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে। (১৫৫) আর মূসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক—সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা (আঃ) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীব-জন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসতো না।

তফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত।—(কুরতুবী)

তফসীরে রূহুল-বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে, وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বেদআত অবলম্বন করে (অর্থাৎ, ধর্মে কোন রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে।—(মাযহারী)

ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বেদআ'ত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিবজীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে—তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবে পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওরাতের তখতিগুলো আবার তুলে নিলেন। আল্লাহ্ তাআলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলনে' হেদায়েত ও রহমত ছিল।

نسخة বা 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) রাগের মাথায় যখন তওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়িতে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোন কিছুতে লেখা তওরাত দান করেছিলেন। তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তর জন বনী-ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা : চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলদিগকে দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহ্‌রই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। মূসা (আঃ) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। মূসা (আঃ) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহ্‌র কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহ্‌রই, না অন্য কারও! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহ্‌কে যখন প্রকাশ্য আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবী যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষানল বর্ষিত হল। ফলে তাদের নীচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হল বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যতঃ মৃতে পরিণত হল। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারায় এ ক্ষেত্রে صاعقة (সায়ে'কাহ্) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رجفة (রাজফাহ্)। 'সায়েকা' অর্থ বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ্' অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যতঃ মৃত বলেই মনে হতে পারে। এঘটনায় হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়তঃ জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন! তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাত হত্যা করবে। সেজন্যেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করলেন; ইয়া পরওয়ারদেগার, আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাই যদি হতো, তবে ইতিপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফেরাউনের সাথে তাদেরও সলিল সমাধি হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ইবা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এক্ষেত্রে 'নিজকে নিজে ধ্বংস করা' এজন্য বলা হয়েছে যে, এই সত্তর জনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে মূসা (আঃ)-এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন করলেন যে, আমি জানি, এটা একান্তই পরীক্ষা, যাতে আপনি কোন কোন লোককে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার না-শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহ উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক—আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا
هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اَلَّذِيْنَ
يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ
اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾
قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا
الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ
وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾ وَ
مِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৬) আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমার আযাব তারই উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (১৫৭) সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। (১৫৮) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। (১৫৯) বস্তুতঃ মূসার সম্প্রদায়ে একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খাতেমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণতঃ আল্লাহ্র রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক; আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নেয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহেযগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত শর্তসমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা উম্মী-নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নাহ্র আনুগত্য – অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এখানে মহানবী (সাঃ)-এর দু'টি পদবী 'রসূল' ও 'নবী' – এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। امى (উম্মী) শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না। সাধারণ আরবদিগকে সে কারণেই কোরআন اميين (উম্মিয়্যীন) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রসংশনীয় গুণ নয়, বরং ক্রটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্বও, তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জেযা ছাড়া আর কি হতে পারে—যা কোন প্রথম শ্রেণীর বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মত একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত রসূল হওয়ার এবং কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ ও পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোন প্রশংসাবাচক গুণ নয়; বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, ইহুদী-নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদ একথা বলেনি

যে, আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী (সাঃ)-এর অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হুযুর আকরাম (সাঃ)-কে দেখারই শামিল। আর এখানে তওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বনী-ইসরাঈলরা এ দু'টি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী (সাঃ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আঃ)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী-নবী ও খাতেমুল আম্বিয়া আলাইহিস্সালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন ঃ বর্তমান কালের তওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাতে এমনসব বাক্য ও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ- মোস্তফা (সাঃ) - এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন একথাটি যদি বাস্তবতা বিরোধী হত, তবে সে যুগের ইহুদী ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে -উম্মী (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদী বা নাসারারা কোরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতেমুন্নাবিয়ীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী) (সাঃ)-এর যেসব গুণবৈশিষ্ট্য তওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কোরআন মজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হুযূরে আকরাম (সাঃ) - এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (রহঃ), দালায়েলুন্নুবুয়্যাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন এক ইহুদী বালক নবী করীম (সাঃ)- এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) তার অবস্থা জানার জন্য তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তওরাত তেলাওয়াত করছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে ইহুদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর তওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্, তিনি (অর্থাৎ, এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রসূল। অতঃপর হুযূরে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেয়া হবে না।— (মাযহারী)

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন যে, হুযূর আকরাম (সাঃ) - এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হুযুর (সাঃ) বললেন, এমুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুযুর (সাঃ) বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে—আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুযুর (সাঃ) সেখানেই বসে পড়লেন এবং যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার নামায সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাযও সেখানই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন ; আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে হুযুর (সাঃ)-কে ছেড়ে দেয়। হুযুর (সাঃ) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুযুর (সাঃ) বললেন, 'আমার পরওয়ারদেগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।' এহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল – اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল।) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি নয়। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি ঃ

''মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেযাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।''

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহ্র রসুল। আর এই হল আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশী খরচ করতে পারেন। সে ইহুদী বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ।—(বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুওয়্যাত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'তফসীরে-মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।'

ইমাম বগভী (রহঃ) নিজ সনদে কা'আবে আহবার (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তওরাতে হুযুর আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে লেখা রয়েছে ঃ

''মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়, তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ, আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তাআলার

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন উর্ধ্বারোহণকালে তকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময় নামায পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে 'তহবন্দ' (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহবান করবেন। জেহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন নামাযে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তেলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ।"—(মাযহারী)

ইবনে সা'আদ ও ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রাঃ) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) – এর গুণ – বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে, ঃ

"তিনি খুব বেঁটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তাঁর দু'কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহঙ্কার মুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হবেন। তাঁর নাম হবে আহ্মদ।"

আর ইবনে সা'আদ, দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাবকাত, মুসনাদ ও 'দালায়েলে নবুওয়ত' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ; যিনি ছিলেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং তওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মীশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ, আরবদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তাঁর মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই) – এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।"

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রাঃ) থেকে বোখারী শরীফেও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ-বিশারদ আলেম হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রাঃ) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়েলে-নবুওয়ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে,

"আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন যে, হে দাউদ, আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে 'আহ্মদ'। আমি তাঁর প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনোও আমার নাফরমানী করবেন না। আমি তাঁর গত-আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হল দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ্)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর সেসব ফরয আরোপ করেছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিন আমার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের নূরের মত হবে। হে দাউদ, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দেইনি। (১) কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। (২) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (৩) যে মাল সে পবিত্র মনে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ বেশী দিয়ে দেব। (৪) তাদের উপর কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। (৫-৬) তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখেরাতের পাথেয় করে দিয়ে।"—(রূহুল মা'আনী)

শত শত আয়াতের মধ্যে এ ক'টি রেওয়ায়েত তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়ায়েতসমূহ মোহাদ্দেসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান যমানায় হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কীরানভী মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ 'এযহারুল-হক' এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীল যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী (সাঃ) –এর বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে তওরাতের উদ্ধৃতিতে রসূলে করীম (সাঃ) – এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে একথাও ছিল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বদ্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং نهى عن المنكر (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা)-এর জন্য যে অঢেল স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এসমস্ত গুণাবলীও হয়ত তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ, অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী-ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রসূলে করীম (সাঃ) সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, মহানবী (সাঃ) সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।– (আস্সিরাজুল -মুনীর) কোন কোন মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকে পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ) মানুষের উপর থেকে ... বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল।

اصر (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اغلال (আগলাল) غل এর বহুবচন। 'গাল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যদ্দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

اصر (ইসর) ও اغلال (আগলাল) অর্থাৎ, অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা দিয়ে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী-ইসরাঈলদের জন্যে যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জেহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোন অঙ্গ দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে, সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য, ওয়াজিব। কারো হত্যা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, খুনের ক্ষতিপূরণের কোন বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কোরআনে সেগুলাকে 'ইস্‌র' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ, এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এ বিষয়টিই বলেছেন যে, আমি তোমাদিগকে একটি সহজ ও সাবলীল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোন পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোন ভয়-ভীতি।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, الدين يسر অর্থাৎ, ধর্ম সহজ। কোরআন কারীমে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।

উম্মী নবী (সাঃ) -এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে ঃ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ, তওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী (সাঃ)-এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ, যারা কোরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ মহানবী (সাঃ) -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কোরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বোঝাবার জন্য عَزَّرُوهُ (আযযারূহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تعزير থেকে উদ্ভূত। تعزير (তা'যীর) অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) عَزَّرُوهُ (আযযারূহু) – এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تعزير (তা'যীর)।

তার অর্থ, যারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু হুযূর (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দ্বীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবী সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কোরআনে কারীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও নিজেই আল্লাহ্‌র কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ—যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোন উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কোরআন-কারীমের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরয ঃ এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে – يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ – এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে – وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ – এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবীর' অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কোরআন ও সুন্নাহ উভয়টি অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহ্‌র অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহব্বত থাকাও ফরয ঃ উল্লেখিত বাক্য দু'টির মাঝে وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ শীর্ষক দু'টি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণতঃ দুনিয়ার শাসকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, অন্তরে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর মহব্বত ও ভালবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধি-বিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ, উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একে তো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়তঃ তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রসূলে করীম (সাঃ) জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি

স্থাপনকারী একক মহত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী (সাঃ)–এর মাঝে যাবতীয় মহত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্বের দাবী পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রসূল হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকেম হিসাবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসাবে তাঁর সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরয হওয়াই উচিত। কারণ, এছাড়া নবী–রসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি ; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি–নীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যে সেদিকেই হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)–এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তাঁর স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে –

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে – يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ, যদি মজলিসে হুযুর আকরাম (সাঃ) উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোন কথা বলো না।

হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হুযুর (সাঃ)–এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)–কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে – لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী (সাঃ)–এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) যখন মহানবী (সাঃ)–এর খেদমতে কোন বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন, যেন কোন গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)–এর ও।—(শেফা)

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হুযুর আকরাম (সাঃ)–এর আকার–অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এ জন্যে অপারক যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ)–এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, মজলিসে যখন হুযুর আকরাম (সাঃ) তশরীফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রাঃ) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন; আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওর্ওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)–কে হুযুর (সাঃ)–এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল ; "আমি কিস্রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সাহাবীগণের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)–এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর আকরাম (সাঃ) যখন ঘরের ভেতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম বে–আদবী মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশী জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী (সাঃ)–এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে–নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোন ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ)–এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুযুর আকরাম (সাঃ)–এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুওয়তী ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীনও এ কারণেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আঃ) – এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রেসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর রেসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)–কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুওয়ত লাভ ও রেসালতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যন্তের জন্য তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই -নবুওয়তের ধারাও সমাপ্ত ঃ নবুওয়ত সমাপ্তির এটাই হল প্রকৃত রহস্য। কারণ, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাবের না কোন প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোন অবকাশ আছে। আর এই হল মহানবীর (সঃ) -এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মোকাবেলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট - সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবেন; যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী (সাঃ)-এর রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত, নায়েব।

ইমাম রাযী (রহঃ) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ, সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা নাহলে বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (রহঃ) সর্বযুগে এজমায়ে-উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরীয়তের দলীল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোন ভুল বিষয় কিংবা কোন পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুওয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের উপরই আমল করবেন। (হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরীয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।) বিশুদ্ধ রেওয়াত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবুকের (তাবুক যুদ্ধের) সময় রসূলে করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হুযূর (সাঃ)-এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুযূর নামায শেষ করে এরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রেসালত ও নবুওয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধেপ্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামায যে কোন যমি, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের এবাদত শুধু তাদের উপসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের নামায বা এবাদত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন- আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যেক রসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো যে, আপনি কোন একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্ম হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহ্মদ (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খ্রীষ্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বোখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত ওমর (রাঃ) নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রাঃ) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, দোষ আমারই বেশী। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম ঃ "হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের আল্লাহ্ রসূল।"

তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু বকর (রাঃ)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি

দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সাঃ)–এর ব্যাপকভাবে রসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোন সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

হযরত মূসা (আঃ)- এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল ঃ দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ) –এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে মূসা (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কূটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন (সাঃ)–এর আবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী–ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কোরআন মজীদে বারংবারই করা হয়েছে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (রহঃ) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাআত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী–ইসরাঈলদের গোমরাহী, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী–ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমাদিগকে এদের থেকে সরিয়ে কোন দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দ্বীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোন ভূ–খণ্ডে পৌছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রসূলে করীম (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহ্র মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মে'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর (সাঃ)–কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী (সাঃ)–এর উপর ঈমান আনে। হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের কি মাপ–জোখের কোন ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল যে, আমরা যমীতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দেই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ–জোখের কোন প্রয়োজন পড়ে না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ, কেউ যদি তা করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘর–বাড়ীগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর হুযূর (সাঃ) যখন মে'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আয়াতটি নাযিল হল وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ তফসীরে–কুরতুবী

এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাসীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মূসা (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হুযূর (সাঃ)–এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী–ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন যেখানে যাওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী)।

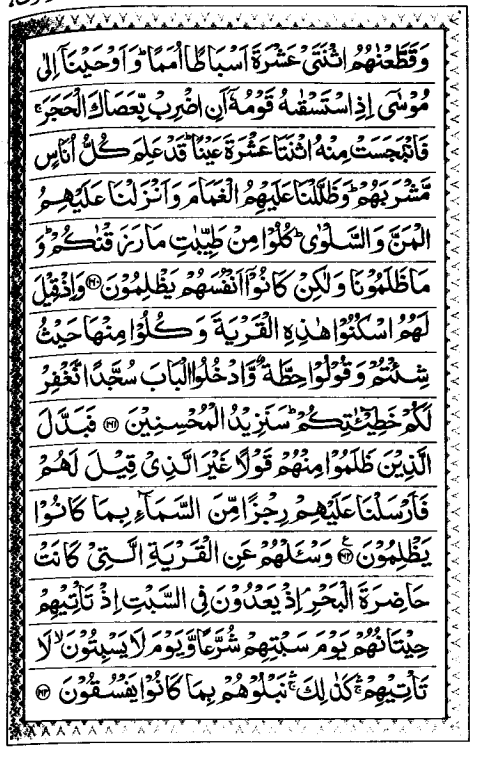

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى
مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ
فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ
مَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَاِذْ قِيْلَ
لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ
شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ
لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ
حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا
تَاْتِيْهِمْ ۛۚ كَذٰلِكَ ۛۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

(১৬০) আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই। (১৬১) আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদিগকে অতিরিক্ত দান করব। (১৬২) অনন্তর জালেমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে। (১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)–এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদী)–এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দু'টি শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হল প্রথমতঃ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোন ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এরচেয়ে বেশী কোন গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদীরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ
مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ
الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

(১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান–কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। (১৬৫) অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না–ফরমানীর দরুন। (১৬৬) তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬৮) আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল, আর কিছু অন্য রকম। তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তারিকারী হয়েছে কিতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুতঃ এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারো তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্‌র প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আলয় ভীতদের জন্য উত্তম—তোমরা কি তা বোঝ না? (১৭০) আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হল এই যে, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا এর মর্মও তাই। قطعنا শব্দটি تقطيع থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড–বিখণ্ড করে দেয়া। আর اُمَمٌ হল اُمَّةٌ এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। মর্ম হল এই যে, আমি ইহুদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বুঝা গেল যে, কোন জাতিবিশেষের কোন এক স্থানে সমবেত জীবন যাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামত ; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একরকম ঐশী আযাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র এ নেয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কেয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদীনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা সব সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তীনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ, সদাসত্য রসূলে করীম (সাঃ)–এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় তাই ঘটবে। শেষ যমানায় ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রীষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদীদের সাথে জেহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহ্‌র অপরাধীকে সমন জারি করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাযির করা হবে না। বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অপরাধী পায়ে হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাযির হবে। হযরত ঈসা (আঃ)–এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদীদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে ঈসা (আঃ)–এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করা সহজ হয়। আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদিগকে সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতঃপর শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এই সমবেত হওয়া বর্ণিত আযাবের পরিপন্থী নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুতঃ এটা এমন একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ, অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়

প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলাবাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেয়ায় এ জাতির কোন ক্ষমতালাভ ঘটে না। কোরআনে করীম তাদের সম্পর্কে কেয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে, আর বাদবাকী হযরত ফারুকে আযমের মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদীদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হল এই .... مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ অর্থাৎ, 'এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।' 'অন্য রকম'-এর মর্ম হল এই যে, কাফের দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তওরাতের যুগে তওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক, যারা তওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ, আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভাল অবস্থার দ্বারা' এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাহোক, সারমর্ম হল এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ অর্থাৎ, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে ঃ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল একটা শাস্তি। দ্বিতীয়তঃ পার্থিব আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ-কষ্ট তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা কাঁদাকাটার বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহঙ্কারী হয়ে উঠার মত কোন উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদেগারের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলের সব আলেমই এমন নয়—কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাযও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতিপূর্বে এসেছে। অর্থাৎ, তওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন, তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে, يُمَسِّكُوْنَ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা। অর্থাৎ, তার সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ وَ
إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا
أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ
مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ
ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾ مَن يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

(১৭১) আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার। (১৭২) আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী–আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। (১৭৩) অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বর প্রথা তো আমাদের বাপ–দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান–সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে? (১৭৪) বস্তুতঃ এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৭৫) আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (১৭৬) অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপাতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। (১৭৮) যাকে আল্লাহ্ পথ দেখাবেন, সে–ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এখানে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তওরাতের বিধি–নিষেধ একটি দু'টি নয়, শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কিতাবের বিধি–বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল নামায। তদুপরি নামাযের অনুবর্তিতা ঐশী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাযে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাযের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি–বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ্ হাদীসে রসূলে–করীম (সাঃ)–এর এরশাদ রয়েছে—'নামায হল দ্বীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দ্বীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

সে কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ এর পরে وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ বলে এ কথাই বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে। আর যে নামাযের ব্যাপারে গাফেলতি করে, সে যত তসবীহ্–ওযীফাই পড়ুক কিংবা বড় মুজাহাদা–সাধনাই করুক না কেন আল্লাহ্র নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কারামত–কাশফও হয় তবুও তার কোন গুরুত্ব আল্লাহ্র কাছে নেই।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর ঃ এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন মজীদের পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই, যার ভিত্তিতে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এই ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীন কবুল করার জন্য বনী–ইসরাঈলদিগকে বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামী প্রতিজ্ঞা–প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামী শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আলাস্ত'–সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণ ঃ এ আয়াতগুলোতে সে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সেসময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় عهد ازل বা عهد الست

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমন্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যাকিছুই রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো কোন বিধান চলতে পারে, আর নাই বা থাকতে পারে তাঁর কোন কাজের উপর কারও

কোন প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী ও সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্যে রয়েছে সব রকমের আযাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরামাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজ-কর্ম; বরং মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরী করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেয়া এবং সেজন্য সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোন লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত- পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায়, যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ, এমন কোন বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে ঃ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ অর্থাৎ, মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আযাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহা বিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ-কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোন কোন অপরাধী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলে দাবী করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোন সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে—

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মত নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্য সাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরী করেন যে, যে-ই বিরুদ্ধাচরণ করবে সে-ই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয় ; বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহুগুণ বেশী। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসাবেই তৈরী করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী নির্দেশনামা। এক বিরাট সংখক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান পালনকর্তাকে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দেয়া, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমন্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মত এমনসব নির্দশন স্থাপন করে দেয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোন সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ —অর্থাৎ, যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না?

তাছাড়া যারা গাফেল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এটাও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রসূলগণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কোরআন মজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রসূলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত; রেসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশঙ্কাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্‌র এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রেসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে।

তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য—যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি যা আমাদের রসূল মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে সমস্ত নবী-রসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তাঁরা 'নবীয়ে-উম্মী' খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বার বার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়আত গ্রহণের তাৎপর্য ঃ নবী-রসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখগণের মাঝে বায়আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এই ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবীগণ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়আতের মধ্যে 'বায়আতে-রেদ্ওয়ান-এর কথা কোরআন করীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশেষ গাছের নীচে আপনার হাতে বায়আত নিয়েছেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারগণের বায়আতে 'আকাবা' ও এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর নিকট থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়আত নেয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সৎকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ ও নবী-রসূলগণের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোন বুযুর্গের হাতে হাত রেখে দেয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয়—তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়আত হল একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অন্যথায় এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে যা বনী-ইসরাঈলদের কাছ থেকে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে নেয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عهد الست (আহদে-আলাস্ত) বলে প্রসিদ্ধ।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ এ আয়াতগুলোতে আদমসন্তানদের বুঝাবার জন্য ذريت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذرأ (যরউন্) থেকে গঠিত। যার অর্থ সৃষ্টি করা। কোরআন করীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাৎ'-এর শাব্দিক তরজমা হল সৃষ্টি। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা ঃ

ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারূকে আ'যম (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তাহল এই—

'আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোযখে যাবার মতই কাজ করবে।' সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, প্রথমেই যখন জান্নাতী ও দোযখী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশে? হুযূর (সাঃ) বললেন, 'যখন আল্লাহ্ তাআলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে দোযখের জন্য তৈরী করেন, তখন সে দোযখের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।'

অর্থাৎ, মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা আদম (আঃ)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ—যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ—যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল।

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত'-এর আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কোরআনের শব্দে 'বনী-আদম' অর্থাৎ, আদমসন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, আদম (আঃ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে, যারা সরাসরি আদম (আঃ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যান্যদেরকে। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদমসন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদিগকে, অতঃপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদিগকে আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কোরআন মজীদে সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদমসন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সূক্ষ্মতর অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। কারণ, পালনকর্তা, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশীর ভাগ সে ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লেখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কাল বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে, তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরি আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোন রং বা বর্ণ নেই; শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, কেয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ, হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদমসন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মত। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোন সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমন্ডলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ্ তাআলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদমসন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল?

দ্বিতীয়তঃ এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কেমন করে হল, যাতে তারা আল্লাহ্কে চিনতে পারবে এবং তার পালনকর্তা হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ, পালনকর্তার কথা সে-ই স্বীকার করতে পারে, যে পালনকর্তা সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল-এ সম্পর্কে মোফাস্সেরে কোরআন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (রহঃ) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তাহল এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হল, 'ওয়াদিয়ে নু'মান'- যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে।—(তফসীরে-মাযহারী)

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোন স্রষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে! এর উত্তর হল এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল! আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ্-জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব ও কুদরতের এমনসব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কোরআনে রয়েছে-

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ, অর্থাৎ, বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে), তবুও কি তোমরা দেখছ না?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহ্দে আলাস্ত) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্ততঃ সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হল?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদমসন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যারা একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হল এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে

খোদা-পরিচিতির একটা বীজ বপন করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফুল-ফসল এই যে, প্রতিটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে—তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্টি-পূজার কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহ্‌র ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোন গোমরাহ্ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন كل مولود يولد على الفطرة কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে على هذه الملة (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ, প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ, ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতা-মাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন যে, আমি আমার বন্দাদিগকে 'হানীফ' অর্থাৎ, এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে, যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রসূল (আঃ)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক। সেগুলো কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান আর বাম কানে একামত ও তকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদু লিল্লাহ্) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে—যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তাহল এই যে, এতেকরে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে কর। এমনিভাবে যারা কোরআনের ভাষা জানে না তাদের প্রতিও কোরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয় তো এই যে, এতেকরে অন্ততঃ এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সেজন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ অর্থাৎ, এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ অর্থাৎ, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যেও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কেয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি, ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ্ তাআলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোন কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোন মানুষ প্রভৃতির কোন একটিও এমন নয়, যাকে কোন মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ে বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ, আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ, একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

উল্লেখিত আয়াতে বনী-ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল যা আল্লাহ্ তাআলা আদিলগ্নে সমস্ত আদমসন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদী-নাসারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লেখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদীরা খাতেমুন্নাবিয়্যীন (সাঃ)-এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকার-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনী-ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঃ এ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে বনী-ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হল।

কোরআন মজীদে সে লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবেঈনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরত ইবনে মারদুওয়াহ্ (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল্আম ইবনে বাউ'রা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহ্র কোন কোন কিতাবের এলেম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআন করীমে যে اَلَّذِیْٓ اٰتَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে এলেমের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

ফেরাউনের জল-মগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মূসা (আঃ) ও বনী-ইসরাঈলদিগকে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম হল এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মূসা (আঃ) সমগ্র বনী-ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন—পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জল-মগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হল। তারা সবাই মিলে বাল্আম ইবনে বাউ'রার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মূসা (আঃ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর সাথে; তারা এসেছে আমাদিগকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল্আম ইবনে বাউ'রা ইস্মে আ'যম জানত এবং সেই ইস্মের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হত।

বাল্আ'ম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ! তিনি হলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহ্র ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহ্র দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি! আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল্আ'ম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই; এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেয়া হল, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একটা লোভনীয় উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচবিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি একাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মূসা (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহ্র মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিষয় দেখা দেয়—মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বাল্আ'ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়—আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হল। আর বালআ'মের শাস্তি হল এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদিগকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তাহল এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদিগকে সাজিয়ে বনী-ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোন রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ ব্যবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গযব ও অভিসম্পাত নাযিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বালআ'মের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হল এবং সেমতেই কাজ করা হল। বনী-ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হল না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী-ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হল। এমনকি যে লোক অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী-ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হল।

কোরআন মজীদে উল্লেখিত ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ, আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। انسلاخ (ইন্সেলাখুন) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে

পড়েছে। فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ (শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ, যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত।) অর্থাৎ, শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে أَخْلَدَ শব্দটি اخلاد ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর ارض -এর প্রকৃত অর্থ হল ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যাকিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমিসংক্রান্ত বিষয়সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বস্তু-সামগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েস নির্ভরশীল। সুতরাং ' ارض ' (আরদ) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এই বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে- فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث - لهث শব্দের প্রকৃত অর্থ হল জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেয়া।

প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভেতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভেতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ্ তাআলাও প্রত্যেক জীবের জন্য একাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভেতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভেতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব-জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়।

কোরআন করীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মত হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর না-ই করুক, সে যে কোন অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে—

প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং এবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। যেমন হয়েছিল বাল্‌আ'ম ইবনে বাউরার পরিণতি। এবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ, ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বাউরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থতঃ অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হল নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলার আযাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ নিজেও একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا
يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا
يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي
مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَ
يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ
عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

(১৭৯) আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (১৮০) আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। (১৮২) বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমানুয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। (১৮৩) বস্তুতঃ আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। (১৮৪) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে। (১৮৫) তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যাকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তাআলা বস্তু-সামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুতঃ এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে? (১৮৬) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন। তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন। (১৮৭) আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিনএর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন অপানি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের না বোঝা, না দেখা ও না শোনার তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে সেসব লোকের বোঝা, দেখা ও শুনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা কালাও নয় যে, কোন কিছু শোনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবর্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা-উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড় পদার্থের মাঝে। যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সে শক্তি-সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশী রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে, যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি-উপলব্ধি সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নম্বর; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশী। কিন্তু ততটুকু বেশী যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে মানুষের নম্বর; যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হল নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্তুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভাল, মঙ্গল ও কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যাকিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানব জাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝেই এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভাল-মন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং চেতনা-উপলব্ধিও দেয়া হয়েছে সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতেকরে সাধারণ জীবের স্তরের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি, চেতনা ও উপলব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বোঝা, তার দর্শন ও শ্রবণ অন্যান্য জীব-জন্তুর বোঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন, শ্রবণ ও বিবেচনাশক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্যান্য

জীব-জন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা, কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাকা সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কোরআন করীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদিগকে صُمٌّ بُكْمٌ ও عُمْيٌ অর্থাৎ, কানা, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বোঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় না; বরং স্বয়ং কোরআন-করীম তাদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছে- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ অর্থাৎ, 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে একান্ত গাফেল'। আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে— وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 'তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল'। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীব-জন্তুর থাকে—অর্থাৎ, শুধু পেট ও দেহের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোন কিছুই না ভাবা বা না দেখা—সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি-অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভরে দিক না কেন, কিন্তু এসবই পেট ও শরীরের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কোরআন তাদেরকে অন্ধ-বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যাকিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যাকিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শোনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীব-জন্তুর পর্যায়ের বোঝা, দেখা ও শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান।

এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে— أُولٰٓئِكَ كَالْأَنْعَامِ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার কারণ চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার শরীয়তের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়—তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সে জন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক নির্বুদ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ অর্থাৎ, এরাই হলো প্রকৃত গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا অর্থাৎ, সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

'আসমায়ে-হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ ঃ উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর যার উর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানাহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে কোন পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ-এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوهُ بِهَا অর্থাৎ, — এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহ্‌কে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহবান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর দোয়া শব্দটি কোরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্‌র যিক্‌র, প্রশংসা ও তসবীহ্-তাহ্‌লীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তসবীহ্-তাহ্‌লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা, আল্লাহ্‌র নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা ঃ এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দু'টি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যেকোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করে দিয়েছেন যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ, আল্লাহ্‌র গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ

চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে।

ইমাম বোখারী ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (রহঃ) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম পাঠান্তে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন – ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ, 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দোয়া যে একটি এবাদত তার সওয়াব দোয়াকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে– الدعاء مخ العبادة অর্থাৎ, দোয়া হল এবাদতের মগজ। যে উদ্দেশে মানুষ দোয়া করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিকর করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ —।

لا اله الا الله العظيم الحليم – لا اله الا الله رب العرش العظيم – لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم –

'মুসতাদরাকে হাকেমে' হযরত আনাস (রাঃ)– এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে-করীম (সাঃ) হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ)-কে বলেন, আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে! সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে—

ياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لى شانى
كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين

এ আয়াতটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনাহীন। সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হেদায়েত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যেকোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকবে; কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ্ তাআলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে– وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী الحاد (এলহাদ) অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে لحد বলা হয়। কারণ, তাতেও লাশ মাঝ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কোরআনের পরিভাষায় الحاد বলা হয় কোরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়াকে।

এ আয়াতে রসূলে-করীম (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে হুস্‌নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ, অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।

আল্লাহ্‌র নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি দিক ঃ আল্লাহ্‌র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারোই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে আল্লাহ্ তাআলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌কে 'করীম' বলা যাবে, কিন্তু 'সখী' বা 'দাতা' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু জ্যোতি বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু 'তবীব' বা 'চিকিৎসক' বলা যাবে না। কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহ্‌র যে সমস্ত নাম কোরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়।

কোন লোককে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েয নয় ঃ তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুস্‌নাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারোও জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাসীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো

জন্যে যেসব নামের ব্যবহার কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো জন্যে এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লেখিত 'এলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্‌মান, সুব্‌হান, রায্‌যাক, খালেক, গাফ্‌ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রায্‌যাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্‌যাক, রাহ্‌মান কিংবা সুব্‌হান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শেরেকী সুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হল একান্ত ভাগ্যসংক্রান্ত। এতে তাঁর কোন হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন!

এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (এক) তওহীদ। (দুই) রেসালত। (তিন) আখেরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখিত অয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ) হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরাইশরা হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন,—এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবীও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদিগকে বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্ততঃ আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাযিল হয় يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লেখিত ساعة শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় ساعة (সাআত), যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয়। কোরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أَيَّانَ (আইয়্যানা) অর্থ কবে। আর مُرْسَاهَا (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

لَا يُجَلِّيهَا শব্দটি تجلية থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً (বাগ্‌তাতান) অর্থ অকস্মাৎ। حَفِيٌّ (হাফিয়্যুন) অর্থ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্ক প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কেয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাকাদা। তা না হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকের তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ, কেয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কেয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে-তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে।—(রূহুল-মা'আনী)

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কেয়ামতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হেকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতেকরে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেয়া হয়েছে যে, কোন একদিন কেয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহ্‌র সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেয়া হবে। যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নেয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা

করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবী হল বয়সের অবকাশকে গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে ঃ يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদিগকে তার যথাযথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবী হল এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আযাবের ভয় করে নেক আমল অবলম্বন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল তাদের একথা বোঝা যে, মহানবী (সাঃ) অবশ্যই কেয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সেকথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদিগকে কেয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে এরশাদ হয়েছে قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, আপনি লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূলগণেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে না যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন যা কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসুল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশতঃ মনে করে যে, কেয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রসুল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী (সাঃ)-এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ এলেম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ-(নাউযুবিল্লাহ্)। কিন্তু উপরোল্লেখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হল এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হাঁ, মহানবী (সাঃ)-কে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী (সাঃ) বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে-''আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল।—(তিরমিযী)

কোন কোন ইসলামী কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর কোন হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোন বিরোধ ঘটে না। ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যই হয় তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন যে, ''পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।'' এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেয ইবনে হাযেম উন্দুলুসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।—(মুরাগী)

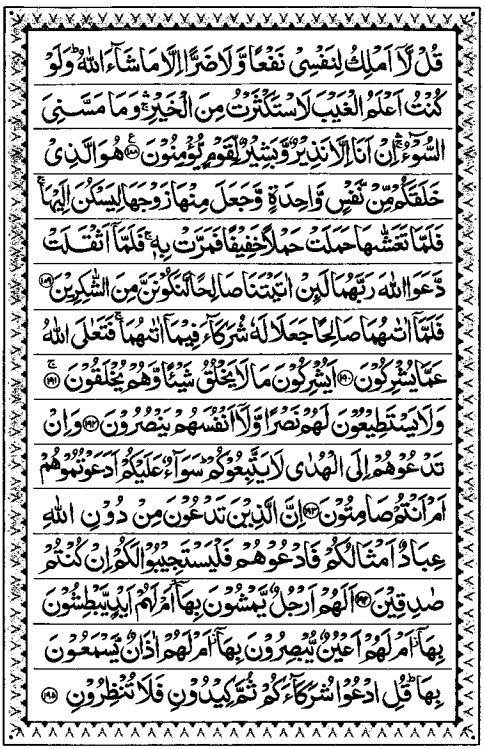

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ
كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ
السُّوْٓءُ ۛؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِىْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ
فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ
دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾
وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۲﴾ وَاِنْ
تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ
اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ
بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ
بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۱۹۵﴾

(১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (১৮৯) তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে ; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহ্কে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। (১৯০) অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু উর্ধ্বে। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৯২) আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) আর তোমরা যদি তাদেরকে আহবান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহবান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। (১৯৪) আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত-যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যদ্দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্দ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্দ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যদ্দ্বারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছেন। তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহ্র মতই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ আয়াতে তাদের এই শেরেকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, এলমে-গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক এলেম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রসূলগণই হোক, শেরেকী এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ্ তাআলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শেরেকী। বস্তুতঃ এই শেরেকী বা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কোরআনে করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এরশাদ হয়েছে, এলমে-গায়ব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ—যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত—তাও আল্লাহ্র একক গুণ। এতে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শেরক।

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই—অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা!

এভাবে তিনি যেন একথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়ব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রসূলে করীম (সাঃ) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়রিয়ার সন্ধির সময় হুযুর (সাঃ) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে-কেরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয় তো এই ছিল যাতে

إِنَّ وَلِـۧيَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوا
وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ
اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ
مَا يُوحٰى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّي ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّ
رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

(১৯৬) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ্‌, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুতঃ তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। (১৯৭) আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। (১৯৮) আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। (১৯৯) আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে থেকে দূরে সরে থাক।(২০০)আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২০১) যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।(২০২)পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না। (২০৩) আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে আসলেন না, তখন আপনি বলে দিন, আমি তো সে মতেই চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে। এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত ও রহমত সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (২০৪) আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। (২০৫) আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্মরণ করেন তাঁর পবিত্র সত্তাকে; আর তাঁকেই সেজদা করেন।

মানুষের সামনে কার্যতঃ একথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী–রসূলগণ আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী–রসূলগণ খোদায়ী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। যেমন, ইহুদী–খ্রীষ্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রসূলগণ সম্পর্কে খোদায়ী গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শেরক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী–রসূলগণ সর্বশক্তিমানও নন এবং এলমে–গায়বেরও মালিক নন, বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোন রকম সন্দেহ–সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশী। বিশেষ করে আমাদের রসূলে করীম (সাঃ)–কে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত নবী–রসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশী জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত–সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ–অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রসূলে করীম (সাঃ)–কে লক্ষ লক্ষ গায়বী বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় এলমে গায়ব বলা হয় না। কাজেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর জ্ঞানকে 'এলমে–গায়ব' বলা যেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ وَلِـۧيَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِينَ

এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কোরআন। সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর ভাষায় সে সমস্ত লোক, যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী–রসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্‌, যিনি আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ্‌ তাআলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে কোরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দেই এবং কোরআনের প্রতি আহবান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী–রসূলগণের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ্‌ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য

করেন বলেই কোন শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেয়া হয়। আর যদি কখনও কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ, সৎকর্মশীল মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোন কারণে পার্থিবজীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এটাই হল সত্যিকার কৃতকার্যতা।

কোরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামাঃ আলোচ্য আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চাল-চালন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী (সাঃ)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ আরবী অভিধান মোতাবেক **عفو** (আফ্‌বুন)-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তাহল এই যে, **عفو** বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাযীর মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকদের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না ; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য এবাদত-যাকাত, রোযা, হজ্ব এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ্ বোখারী শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে উল্লেখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে হুযুর (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের এক বিরাট জামাত—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লেখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عفو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তফসীরকার আলেমগণের এক দল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-জরীর (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সাঃ) হযরত জিবরাঈল-আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী (সাঃ)-কে জানান যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়া (রহঃ) সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গয্ওয়ায়ে-ওহুদের সময় যখন হুযুর (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সাঃ) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রাঃ)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুযুর (সাঃ)-কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ - معروف অর্থে عرف বলা হয় যে কোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ, যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না ; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ, অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ –এর অর্থ হল এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না ; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে

এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জনোচিত কথা-বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়েত করাও বর্জণ করতে হবে। কারণ, এটা রেসালত ও নবুওয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ্ বোখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ফারূকে আ'যম (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর-ইবনে কায়সের মেহমান হয়। হুর-ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যাঁরা হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ্ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল-মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে-কায়স (রাঃ) ফারূকে আযম (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়াইনাহ্ ফারূকে আযম (রাঃ)_এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) তাঁর এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে-কায়স নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরাল-মু'মিনীন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন।" এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, كان وقافا عند كتاب الله عزوجل অর্থাৎ, আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিতপ্রাণ।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ, আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওসওসা আসতে আরম্ভ করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বোঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্র নিকট পানা-চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক মহানবী (সাঃ)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে হুযুর (সাঃ) বললেন, "আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হল এই اعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم - সে লোক হুযুর (সাঃ)-এর নিকট শোনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, এই কোরআন তোমাদের পরওয়ার-দেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মু'জেযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্র কালাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছে - وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, এই কোরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত ও হেদায়েত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মু'মিনদের জন্যে রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا অর্থাৎ, যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাযের কোরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়; তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল বতীত যেকোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীগণের জন্য কেরাআত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফোকাহা মুক্তাদীগণকে (ইমামের পেছনে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতেহা পড়লেও তা ইমামের কেরাআতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কোরআন-করীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কোরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে।

কোরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করার চেষ্টা করা উভয়টিই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী ও কুরতুবী) আয়াত শেষে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের রহমত হওয়া উল্লেখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর

নির্ভরশীল।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী মাসায়েল ঃ একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআন-করীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহ্‌মতের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র গযব ও রোষানলের অধিকারী হবে।

নামাযের মধ্যে কোরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার বিষয়টি মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে। তবে অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে না যে, ইমাম কোন্ সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কোরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রসূলে করীম (সাঃ) বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে এরশাদ করেছেন ঃ اذا خرج الامام للخطبة فلا صلوٰة ولا كلام অর্থাৎ, ইমাম যখন খুত্‌বার জন্য এসে উপস্থিত হন, তখন না নামায পড়বে, না কোন কিছু বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোন লোক অপর কাউকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশে একথাও বলবে না যে, 'চুপ কর।' (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দেবে), যাহোক, খুত্‌বা চলাকালে কোন রকম কথা-বার্তা, তস্‌বীহ-তাহলীল, দোয়া-দরূদ কিংবা নামায প্রভৃতি জায়েয নয়।

ফেকাহবিদগণ বলেছেন যে, জুম'আর খুত্‌বার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুত্‌বার হুকমও তাই। অর্থাৎ, তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্য নামায এবং খুত্‌বা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যান্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী এমতাবস্থায়ও কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন; আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কোরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করবে, তাকে গোনাহগার বলেছেন। 'খোলাসাতুল-ফাতাওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

কিন্তু কোন কোন ফকীহ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশেই কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। যেমন, নামায ও খুত্‌বা প্রভৃতিতে। আর যদি কোন লোক নিজের ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোন এক স্থানে নিজ নিজ তেলাওয়াতে নিয়োজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াযের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ, সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রি বেলায় নামাযে সরবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আয্‌ওয়াজে-মুতাহ্‌হারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও হুযূর (সাঃ)-এর আওয়ায শোনা যেত।

নীরব ও সরব যিকরের বিধি-বিধান ঃ এ আয়াতে কোরআন করীম নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকর দু'রকম যিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ যিকর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ অর্থাৎ, স্বীয় পরওয়ারদেগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দু'টি উপায় রয়েছে। (এক) জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহ্‌র 'যাত' (সত্তা) ও গুণাবলীর ধ্যান করবে, যাকে "যিকরে কল্‌বী" (আত্মিক যিকর) বা 'তাফাক্কুর' (নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। (দুই) তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ্ তাআলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হল যিকরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের যিকর করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ, এভাবে অন্তরের সাথে মুখও যিকরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোন অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হল শুধু মুখে মুখে যিকর করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা।

যিকরের দ্বিতীয় পন্থা এ আয়াতেই বলা হয়েছে, وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ, সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ্ তাআলার যিকর করবে তার সশব্দ যিকর করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হল এই যে, অত্যন্ত জোরে চীৎকার করে যিকর করবে না। মাঝামাঝি আওয়াযে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে যিকর বা তেলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশে যিকর করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র সাধারণ যিকরই হোক, কিংবা কোরআনের তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াযের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশী উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকর বা কোরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমতঃ আত্মিক যিকর। অর্থাৎ, কোরআনের মর্ম এবং যিকরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে; যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়তঃ যে যিকরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশী উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শোনবে। এ দু'টি পদ্ধতিই আল্লাহ্‌র বাণী وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ -এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পদ্ধতিটি হল অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হল আওয়াযকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। যিকরের এ পদ্ধতিটিই وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কোরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا -এতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কেরাআত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়। বরং কেরাআতে যেন মাঝামাঝি আওয়ায অবলম্বন করা হয়।

নামাযের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত ফারুকে আ'যম (রাঃ)-কে এ হেদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সাঃ) শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ, শব্দহীনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি (হুযুর [সাঃ]) সেখান থেকে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াযে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শোনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে হুযুর (সাঃ) বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাআত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম আসতে না পারে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হুযুরে আকরাম (সাঃ) মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন।— (আবু-দাউদ)

সেজদার কতিপয় ফযীলত ও আহ্কাম ঃ এখানে নামাযসংক্রান্ত এবাদতের মধ্য থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাযের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন এক লোক হযরত সওবান (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত সওবান (রাঃ) নীরব রইলেন; কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সেজদা কর তখন তার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত সওবান (রাঃ)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দারদ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদেগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজদারত অবস্থায় খুব বেশী করে দোয়া-প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসাবে কোন এবাদত নেই। কাজেই ইমাম আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া। নফল যতবেশী হবে সেজদাও ততই বেশী হবে।

কিন্তু কোন লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত; ফরয নামাযে নয়।

সূরা আ রাফ শেষ হল। এর শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সেজদা। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোন আদমসন্তান যখন কোন সেজদার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করলো, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।

সূরা আ'রাফ সমাপ্ত